Kushtia College Journal Vol.1, Issue 1&2 *ISSN 3006-1741*
pp. 33-40

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম জনপদের নৃতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার

(Anthropological Inheritance of South-Western Bangladesh)

মোঃ ফিরোজুল ইসলাম[১]

[1]*Dr. Md. Firozul Islam, Professor, Sociology, Kushtia Government College, Kushtia*
E-mail:drf.soc@gmail.com

Abstract

In prehistoric time Bangladesh was known as a vital part of 'Bango Janapada'. Different ethnic groups have been settled in this area at different times. At one phase, the people of these groups abandoned their past racial identities. It was no exception for the people settled in the southwestern part of Bangladesh as a part of ancient Bango Janapada. Their ethnographic inheritance is buried in their physical structure, lifestyle, language, culture, nature of cultivation and food habits etc. Tracing the ancestors of the people in an area is a worthy topic for anthropologists. in that sequence who were the ancestors of the people living here, when did they started farming, and how important their contribution to the language and culture of this region is the main focus of this article. Historical, ethno-historical deduction, ethno-botany method and ethnographic approach is used in this study. By analyzing various historical facts, published books, administrative records, government and state documents, the ancestral identity of the people living in the south-western area of Bangladesh is described.

Key Word ঃ *দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, জনপদ, নৃতত্ত্ব, উত্তরাধিকার।*

পটভূমি (Background)

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনবহুল জাতিরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আজকের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি মূলতঃ প্রাচীনকালের বৃহত্তর বঙ্গদেশ নামক ভূখন্ডটিকে কেন্দ্র করেই আবির্ভূত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বিচিত্র বর্ণ ও জনগোষ্ঠীর মানুষের আগমন ঘটে। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, জলাভূমি, জঙ্গলাকীর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ, এবং শিকারের সহজলভ্যতা প্রভৃতি বিষয় অনেক পরিভ্রমনশীল আদিম জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছে (Majumder, 1971; জলীল, ১৯৭৫)। এরূপ ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অনুকূল পরিস্থিতি প্রাচীন যুগ থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে । ফলে যুগে যুগে নানা যাযাবর প্রকৃতির আদিম মানবগোষ্ঠী ধীরে ধীরে অত্র অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলতে থাকে । বহু শতাব্দী ব্যাপী নানা রক্তধারার সমন্বয়ে অবশেষে এখানে এক বিশেষ মিশ্র জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে (Maloney,1977)।

আনুমানিক সাত হাজার বছর পূর্বে সূচিত দুর্জ্ঞেয় এক জৈব-সামাজিক গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে অভিবাসন ও অভিযোজনের বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের পরিণতি হিসাবে আজকের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। এই সুদীর্ঘ সময়কালে এ ভূভাগের চতুর্পার্শ্বস্থ নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু বর্ণ ও জাতি গোষ্ঠীর ক্ষুদ-বৃহৎ, যাযাবর অর্ধ-যাযাবর বহু মানবগোষ্ঠী এখানে প্রবেশ করেছে। বিশেষভাবে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, যা বঙ্গ নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ভূখন্ড। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ একটি জাতি ও দেশের নামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র গুলোতে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাইরে অবস্থিত বঙ্গদেশের স্পষ্ট উল্লেখ আছে । মহাভারতে (সভাপর্বে) বঙ্গ, পুন্ড্র, সুক্ষ্ম ও তাম্রলিপ্ত এই সমুদয় রাজ্য বলে উল্লেখ আছে । দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের সময় বর্তমান বঙ্গদেশ রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও বঙ্গ এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিলো। বাগড়ী মেদিনীপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী জনপদ নিয়ে গঠিত রাঢ়, উত্তরবঙ্গ নিয়ে বরেন্দ্র এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও রাজশাহী জেলার কিয়দংশ বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল (মজুমদার, ১৯৯৮)।

প্রাচীন যুগের বাংলা তথা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কোন অখন্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিলনা। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন ছোট ছোট অংশে এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভক্ত ছিলো। আর এই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলকে সমষ্টিগতভাবে নাম দেওয়া হয় জনপদ। এই জনপদগুলোর সীমানা সঠিকভাবে নিরুপণ করা না গেলেও চতুর্থ শতক হতে গুপ্তযুগ, মৌর্যযুগ, পাল, সেন প্রভৃতি আমলের উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ১৬টি জনপদের নাম পাওয়া যায়। এগুলো হলো- পুন্ড্র, বঙ্গ, গৌড়, সমতট, রাঢ়, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সপ্তগাঁও, কামরুপ, তাম্রলিপ্ত, রুক্ষ, সুক্ষ, বিক্রমপুর, বাকেরগঞ্জ প্রভৃতি (রায়, ১৯৭৪)। ১৬টি জনপদের মধ্যে মূলতঃ বাংলায় ছিলো ১০টি জনপদ। এর মধ্যে বঙ্গ জনপদটি ছিলো অন্যতম। বক্ষ্যমান নিবন্ধে এই বঙ্গ জনপদের একটি অন্যতম অঞ্চল হিসাবে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অবস্থান । বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পাবনা, ফরিদপুর ও পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি এবং পশ্চিম উচ্চভূমি যশোর, কুষ্টিয়া, নদীয়া, শান্তিপুর ও ঢাকার বিক্রমপুর সংলগ্ন অঞ্চল ছিলো বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত। পাঠান আমলে সমগ্র বাংলা বঙ্গ নামে ঐক্যবদ্ধ হয়। পুরানো শিলালিপিতে বিক্রমপুর ও নাব্য নামে দুটি অংশের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত এবং কালীদাসের রঘুবংশে বঙ্গ নামের অস্তিত্ব বিদ্যমান (সিদ্দিকী, ১৯৯৮)।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের ন্যায় এই বঙ্গভূমিতে এসে আবাস গড়েছে। সেই হিসাবে বাঙ্গালী একটি মিশ্র বা শংকর জাতি। নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, মূলতঃ ৫টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের বাঙ্গালী জাতির পূর্বপুরুষ বলা চলে। বাঙ্গালী শোণিতধারায় মধ্যপ্রাচ্যের 'উর্বর অর্ধচন্দ্রাকার ভূমি' (Fertile Crecent) সভ্যতার মানুষের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মধ্যপ্রাচ্যেও দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী দোয়াবকে 'উর্বর অর্ধচন্দ্রাকার ভূমি' (Fertile Crecent) নামে অভিহিত করা হয়। উর্বর অর্ধচন্দ্রাকার ভূমি হতে কয়েক হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষে ব্যাপক অভিগমন ঘটে (Scheffler, 2003)। এখানে এসে তারা স্থানীয় শিকারী ও সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে যায়। বলা হয় সিন্ধু সভ্যতার জন্মদাতা এই মানুষগুলোই। এরপর স্থানীয় শিকারী ও সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীর সাথে পরবর্তীতে এই সকল মানুষজন বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করে এবং কৃষিভিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করে।

সুদূর অতীতে বঙ্গভূমির জীবনধারা তথা কৃষি সমাজ বিনির্মাণের কারিগর মানুষদের পুর্নাঙ্গ পরিচয় উৎঘাটন এখন প্রায় দূরহ। তবে বিশাল এই বঙ্গভূমির নানা স্থানে বসবাসকারী সেই যাযাবর, অর্ধ-যাযাবর মানবগোষ্ঠীর জৈব স্মৃতিচিহ্নের ক্ষীণধারার রেশ নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়না। প্রাচীন গ্রন্থাদি স্মৃতি ও শ্রুতিশাস্ত্র বিভিন্ন স্থানে অযত্ন অবহেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লিপিমালা আজও কালের স্বাক্ষ্য বহন করে(জলিল, ১৯৭৫, রায়, ১৯৯৭)। আর তা অবলোকন করে পুরানো বঙ্গ সংস্কৃতির একটি মোটামুটি চিত্র নির্মাণ সম্ভব।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল (Southwestern Area of Bangladesh)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল মূলতঃ প্রাচীন বঙ্গ জনপদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমান প্রবন্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বলতে পাবনার জেলার কিয়দংশ, বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা, ঝিনাইদহ, যশোর এবং সাতক্ষীরা জেলাকে বোঝায় । তবে এই গবেষণার ক্ষেত্রে বৃহত্তর কুষ্টিয়া এবং ঝিনাইদহ জেলাকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বিবেচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য (Objective)

সুদূর অতীতকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী প্রাচীন বঙ্গভূমির বর্তমান বাংলাদেশে আগমন করেছে এবং বসতি স্থাপন করেছে। এক পর্যায়ে তারা তাদের অরণ্য জলাশয়চারী জীবনধারা পরিবর্তন করে কৃষিকাজের সূচনা করে অদ্যাবধি তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী বর্তমান জনগোষ্ঠীর নরগোষ্ঠীগত পরিচয় উৎঘাটন,নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রূপায়ণ এবং এদের সাথে প্রাচীন গোত্র/গোষ্ঠীসমূহের সাথে অধিক সাদৃশ্যতার ভিত্তিতে নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সন্ধান লাভ বক্ষ্যমান গবেষণার উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ (Objective Analysis)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লোকসমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় এই সকল আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষজন কিভাবে মৌলিক উপাদান হিসাবে ভূমিকা রেখেছে এবং জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে প্রযুক্ত হয়ে অত্র অঞ্চলের বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যে কিংবা সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা জানা এই প্রবন্ধের একটি উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত। বিবর্তনের ধারায় এই অঞ্চলে বসবাসরত আদিম অধিবাসীদের জীবনের বিভিন্ন দিকের যে পরিবর্তন ঘটেছে তার উপর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তাদের জীবনের বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। ইতিহাসের রুদ্ধপ্রায় গবাক্ষপথে যে স্বল্প তথ্যসমূহ বর্তমানে দৃশ্যমান তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই দক্ষিণ-পশ্চিম জনপদের আদিম জনগোষ্ঠীর লোকজন যেমন- কোল, ভীল, মুণ্ডা, বেনে, বাগদী, হো, মেচ, রাজবংশী

প্রভৃতি মানুষ বিচরণ করেছে প্রাচীনকাল থেকেই । এইসব আদিম অরণ্যচারী মানুষজন কিভাবে তাদের বন, পাহাড়, জলাশয় কেন্দ্রিক জীবনধারা পরিত্যাগ করে অত্র অঞ্চলের সমতল ভূমিতে স্থায়ী আবাস গড়েছে এবং কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের সূচনা করে এই অঞ্চলের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে নিজেদের দৈহিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রেখেছে তা অনুসন্ধানই এই গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের জন্য তথ্য সংগ্রহে ঐতিহাসিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ নৃতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রশাসনিক দলিলপত্র, সরকারি তথ্যাদি ইতিহাসের আলোকে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক পদ্ধতি উত্তম বলে বিবেচিত। এছাড়াও নৃতাত্ত্বিকদের ব্যবহৃত পদ্ধতি অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। অত্র অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজন এবং পূর্বপুরুষ অধিবাসীদের জীবন ঘনিষ্ঠ সার্বিক তথ্য জানতে প্রচলিত নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তথ্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি ঐতিহাসিক জাতিতাত্ত্বিক নিপাতন পদ্ধতি (Ethno-Historical Deduction Method) অধিকতর যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়েছে । তাই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীসমূহের মানুষজনের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা নৃতাত্ত্বিক প্রলক্ষণ, পেশা, ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকজনের দৈহিক প্রলক্ষণ ও জীবনধারাকে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালের পটভূমিতে যুক্তিসিদ্ধ নিপাতনের মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপন এবং উক্ত জনগোষ্ঠী সমূহের সংস্রব নির্ণয়ই এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ।

এছাড়াও জাতিতাত্ত্বিক নিপাতন পদ্ধতির অনুরূপক হিসাবে উদ্ভিদ-জাতিবিদ্যা (Ethno-Botany) পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের লতাগুল্ম ও সবজি- শস্যাদি ও চাষাবাদের প্রবণতার সাথে প্রাচীন চাষাবাদের ধরণ প্রবনতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের সম্পর্কে ধারণালাভ সম্ভব হয়েছে। যাহোক এভাবে ঐতিহাসিক হারানো সুত্র অনুসন্ধাণে (Missing Link) উক্ত পদ্ধতি দুটির পাশাপাশি আধেয় বিশ্লেষণের (Content Analysis) মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যের বিন্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে । পাশাপাশি, কিছু তথ্যের পরিমার্জনের প্রয়োজনে কুষ্টিয়া এবং ঝিনাইদহ জেলার কয়েকটি গ্রামের মানুষজনকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

গোত্রগত পরিচয় (Racial Identity)

ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে আর্যরা গাঙ্গেয় অববাহিকায় বসতি স্থাপনের পর এখানে অন্য আরেকটি জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। পরবর্তীতে আর্যরা তাদের সংস্পর্শে আসে। আর্যরা এদের নিষাদ হিসাবে চিহ্নিত করে, যার অর্থ বন্য। এই বন্যরাই বাংলাদেশের এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। এই সকল বন্য মানুষজন ছিলো প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতিভুক্ত। এরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী উপদলসমূহের একটি। অন্যগুলো ছিলো সিনো-টিবেটিয়ান এবং টিবেটো-বার্মিজ যারা বংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি গড়ে তুলেছিলো (Bakar,1971)।

ভারতবর্ষে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠী আগমন করেছিলো নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর পরে। এরা পশ্চিম দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করে প্রায় সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের ভারতে আগমন এবং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার ফলে সম্ভবত নেগ্রিটো গোষ্ঠীর অপসারণ তরান্বিত হয়। নৃতাত্ত্বিক তথ্যমতে বঙ্গভূমিতে যে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে, প্রটো-অস্ট্রালয়েডরা তাদের পূর্বপুরুষ (পালিত, ১৯৯৮)। একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নরগোষ্ঠীগত পরিচয়ের প্রধান নির্ধারক হিসাবে গাত্রবর্ণকেই সর্বপ্রথম ও প্রধান হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে অত্র অঞ্চলের মানুষের গাত্রবর্ণ প্রটো-অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর গাত্রবর্ণকেই নির্দেশ করে (সিদ্দিকী, ১৯৮৭)। বাংলাদেশের বুকে বিভিন্ন জাতির রক্ত মিশ্রণের এই ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পেরিয়ে ঐতিহাসিক কালের প্রাচীন বাংলায়ও প্রবাহমান। তারই রেশ প্রাচীন বঙ্গদেশের অংশ বাংলাদেশে আজও পরিদৃশ্যমান। আজও এখানে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীসমূহের রক্তধারা একে অপরের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

ঐতিহাসিক কালের গোড়ার দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তথা বঙ্গদেশের সুবিস্তির্ণ ভূমিতে যে আদিম যাযাবর জনগোষ্ঠীর পদচারণ ঘটেছিল, ঐতরেয় আরণ্যক, মহাভারত, মনু সংহিতা অনুযায়ী তারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেনীর । আবার, রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণের নীচে অন্য সব জাতই বর্ণ শংকর । বিভিন্ন জাতের মাতা পিতার সন্তান এরা । যেমন- গোয়ালা, নর, সুতার, কাপালী, নাপিত, কুমার, তাঁতী, শাখারী, কামার, মালাকার, বারুই, ডোম, হাড়ি, চামার, চণ্ডাল, যোগী, কাহার, প্রভৃতি (ওয়াইজ, ২০০২)। তবে বাংলাদেশের বৃহত্তর যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে কোল, ভীল, মুণ্ডা, শবর, হো' ই (Austro-Asiatic Language Group) উল্লেখযোগ্য যারা প্রটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত (Grierson,1906)। এই নৃগোষ্ঠীর নানা জাতিরুপ

ভারতের দক্ষিনাঞ্চল, সিংহল থেকে মালয় ইন্দোনেশিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপ ও অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । এদের দেহ দৈর্ঘ্য খাটো বা মধ্যম, কেশ তরঙ্গায়িত কালো এবং অমসৃণ। অনেক ক্ষেত্রে কপাল ঢালু ও ভ্রু অস্থি বেশ প্রকট। দেহ বর্ণ গাঢ় বাদামী থেকে ঘন কালো । অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এই নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিস্থানীয় (রায়, ১৯৯৭)। প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ 'ঐতরেয় ব্রাক্ষণ' এ অত্র অঞ্চলে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীসমূহকে নিষাদ জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোন কোন গ্রন্থে এদের দস্যু জাতি বলা হয়েছে। আবার মনুসংহিতায় অত্রাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মানুষজনকে পতিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে (Paul,1939)।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার বিলুপ্তির পরে যখন আর্যভাষী মানুষজন উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেছিলো ঠিক সেই সমসাময়িক সময়েই প্রটো-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মানুষজন মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো। আর এদের মধ্য হতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিচরণকারী প্রটো-অস্ট্রালয়েডদের একাংশ পরবর্তীকালে তাদের অন্তর্নিহিত পরিভ্রমনশীল প্রবৃত্তির জন্য কিংবা কোন জনগোষ্ঠীর পূর্বাভিমূখী চাপের মুখে স্থানান্তর করতে থাকে এবং অবশেষে আদি বঙ্গভূমির বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী বরেন্দ্র ভূমির বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করে। এরাই সম্ভবত পরবর্তীকালের কোল, ভীল, মুন্ডা, শবর, হো, খেরওয়ারী, জুয়াং প্রভৃতি উপজাতিগুলোর আদি পূর্বপুরুষ (সিদ্দিকী, ১৯৮৭)।

ভাষা (Language)

কোন জাতিগোষ্ঠী/জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ভাষা মানুষের আত্মচেতনা, বিবেক, অন্তরস্থ ভাব বিনিময় কিংবা সমাজব্যবস্থার দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার অন্যতম মাধ্যমরুপে কাজ করে থাকে। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের রক্তের উত্তরাধিকারের পাশাপাশি ভাষার উত্তরাধিকার গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। দৈনন্দিন কথোপকথন কিংবা হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন দেন দরবার কিংবা সামাজিক চাহিদার বহিঃপ্রকাশ জনগোষ্ঠীর প্রচলিত ভাষায় (Lingua Franca) সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল যা প্রাচীন বঙ্গভূমির একটি জনপদ হিসেবে পরিচিত। এখানকার মানুষ এখনো কুড়ির হিসাবে অভ্যস্ত। যেমন- এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, পণ (চার কুড়ি) প্রভৃতি। এই কুড়ি শব্দটি অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের গণনার ক্ষেত্রে প্রচলিত একটি শব্দ। মানুষের হাত এবং পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা থেকে সাধারণত এই কুড়ি শব্দটি এসেছে। এছাড়াও পণ, গন্ডা,পুড়ি,গুলি অস্ট্রিক ভাষারই দান (রায়, ১৯৭৪)। আর এসমস্ত ভাষার ধারক বাহক হিসেবে উল্লেখিত কোল, ভীল, মুন্ডা, শবর, হো, বেনে, বাগদী, মেচ, কোচ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যারা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর পূর্ব প্রজন্ম। উল্লেখিত জনগোষ্ঠী সমূহের মানুষজনই প্রচীন বঙ্গভূমির বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী প্রথম জনগোষ্ঠী। আর এদেরকেই ঐতরেয় আরণ্যক, ঐতরেয় ব্রাক্ষণ, মনু সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে নিষাদ, কিরাত কিংবা পতিত জন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ এখানকার মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা, সংস্কৃতির ধরণ সবকিছুর সাথেই উল্লেখিত প্রটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণীর মানুষের প্রভূত মিল পাওয়া যায়। যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায় এ অঞ্চলের মানুষের ভাষা কিংবা সংস্কৃতির ধরণ যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। তথাপি, এই আদি অস্ট্রেলীয় শ্রেণীর মানুষজনই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের পূর্ব পুরুষ । নৃতাত্ত্বিকভাবে এটা প্রায় প্রমাণিত।

অস্ট্রিক একটি বিশাল ভাষা পরিবার। এই ভাষা পরিবারের দুটি উপবিভাগ রয়েছে। (১) অস্ট্রো-এশিয়াটিক (২) অস্ট্রোনেশিয়ান। বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে বিশেষভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কেবলমাত্র অস্ট্রো-এশিয়াটিক উপপরিবারের ভাষারই নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ভাষা গবেষকদের মতানুসারে, অস্ট্রিক ভাষায় কথা বলা মানুষেরাই এই বাংলার সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলো যাদের সাথে প্রভূত সাদৃশ্য পাওয়া যায় উল্লেখিত কোল, ভীল, সাঁওতাল,মুন্ডা,শবর প্রভৃতিদের (সামাদ, ১৯৭৮)।

বাংলাদেশের বর্তমান অঞ্চলে আগমনের পর এই সমস্ত মানুষজন বহু শতাব্দী ধরে বন অরণ্য জলাশয়চারী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। খৃষ্টপূর্ব দশম শতকে এদের কোন শাখা অরণ্য জলাশয়চারী জীবনধারা পরিত্যাগ করে চাষাবাদের সূচনা করে। আবার এদের মধ্যে কিছু মানুষজন রক্তের উত্তরাধিকার কিংবা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারা বহন করে চলে সেসময় থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত। যার রেশ বর্তমানে এই অঞ্চলে বসবাসকারী ঐসমস্ত আগমনকারী জনগোষ্ঠীর ক্ষীণ ধারার বর্তমান উত্তরাধিকারী মানুষজন কিছুটা হলেও বহন করে চলেছে। যেমন-বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এখনো কোল,বাগদী বেনে, বুনো, ভীল জনগোষ্ঠীর মানুষজন তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারা অনুসরণ করে শিকার উৎসব, বন পূজা পালন করে।

দৈহিক প্রলক্ষণ (Physical Trait)

সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায়ের মতে, "নিষাদ কিরাত প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর যতটুকু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকেই এটা পরিস্কার যে, তারা বসবাস করতো বনাকীর্ণ কিংবা জলাশয় অঞ্চলে"(চট্টপাধ্যায়, ১৩৫১)। এবনে গোলাম সামাদ তাঁর লিখিত গ্রন্থে সুনীতি

কুমার চট্টপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন "নিষাদ কিরাতদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এরা ছিলো খর্বকায়, অঙ্গার কৃষ্ণ বর্ণ, প্রশস্ত নাসা। এই বর্ণনার সাথে সাঁওতাল,মুন্ডা,কোলদের প্রভূত মিল পাওয়া যায়। আর এদেরকেই প্রটো-অস্ট্রালয়েড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে(সামাদ, ১৯৭৮)। উল্লেখিত জনগোষ্ঠীসমূহের মানুষজনকে আদি অস্ট্রাল শ্রেণীর বলার কারণ হলো- এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাথে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের বেশিরভাগ মিল পরিলক্ষিত। প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থ অনুসারে নিষাদরাই আদি-অস্ট্রাল শ্রেণীর মানুষ (সুর, ১৯৯৮)। বাংলাদেশের উচ্চবর্ণ ও উত্তম শংকর বর্ণের জনসাধারণের মধ্যে যে সকল গোল ও মধ্যম, মুণ্ডাকৃতি তীক্ষ্ণ-উন্নত, মধ্যম নাসাকৃতি এবং মাঝারি দেহ দৈর্ঘ্যে দেখতে পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালের 'আলপাইন' কিংবা আদি-অস্ট্রাল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর দান। এসবকিছু বিবেচনায় বাংলাদেশের যে জনসংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে তার প্রায় সমগ্রই আদি-অষ্ট্রেলীয় ও আলপীয় জনগোষ্ঠীর দান (রায়, ১৯৭৪)।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মূলতঃ প্রাচীন বঙ্গ জনপদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বস্তুতঃ এটি ছিলো প্রাচীন গাঙরাষ্ট্র বা গাঙদ্বীপ। মহাভারতীয় যুগে গাঙরাষ্ট্রটির আদিম অধিবাসীরা ছিলো কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা,শবর, বাগদী প্রভৃতি অনার্য জাতিসম্ভূত গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। একত্রে বসবাস করায় 'কৌম' চরিত্র এদের রক্তধারায় প্রবাহিত। এই ভূখন্ডের সকল কৌম জনপদের অতীত অনুসন্ধানে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এবং তার ফলাফল আমাদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে (আলী, ২০১২)। আদি-অষ্ট্রেলীয় মানুষের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এখানকার মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। জৈন -বৌদ্ধযুগ পরবর্তী সেন রাজত্বকালে এখানে আর্যদের আগমন এবং তাদের এখানে বসবাসের ফলে বর্ণ সংকরের সৃষ্টি হয়। বক্ষ্যমান নিবন্ধে উল্লেখিত গাঙরাষ্ট্রটির সমগ্রটাই বঙ্গ জনপদের একটা অংশ। তাই এখানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সামগ্রীক জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যেরই অংশ বিশেষ হবে এটাই স্বাভাবিক। সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের মধ্যে কোল,ভীল,মুন্ডা,শবর জাতীয় লোকজনের মধ্যে আদি-অষ্ট্রেলীয় জনদের রক্ত প্রবাহই পরিদৃষ্ট হয়। আর এরাই এখানকার আদিম অধিবাসী এবং বর্তমান জনস্রোতের পূর্বপুরুষ ।

ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনা (Historical Information Analysis)

সভ্যতা বিকাশের ধারায় জৈন, বৌদ্ধ যুগ, হিন্দু যুগ, পাঠান যুগ, এই অঞ্চলে বার ভুঁইয়াদের আগমন অতঃপর মোঘল যুগ, সবশেষে ইংরেজ আমল পার হয়ে বর্তমান সভ্যতার ধারার সাথে উল্লেখিত জনগোষ্ঠীসমূহ যুক্ত। আর্য সভ্যতা এখানে বিকশিত হলেও আর্য রক্তের ধারা বলতে গেলে একেবারেই নেই। এখানে বসবাসকারী মুসলমানদের রক্তের পৃথক কোন ধারা কখনও ছিলো ইতিহাসে এরকম প্রমাণ পাওয়া যায়না। এই অঞ্চলে মুসলমান বলতে যাদেরকে বোঝানো হয়, তারা বেশিরভাগই মূলতঃ বিভিন্ন গোত্র গোষ্ঠী থেকে ধর্মান্তরিত (আলী, ২০১২)। পরবর্তীতে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্যদিয়ে এই অঞ্চলের লোক সমাজে এক নতুন সমীকরণ সূচীত হয়েছিলো। নতুন সামাজিক-ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃজন ও পুরাতন সমাজের উপর নতুন এক ধরণের সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একদিকে অর্ধ যাযাবর ও বিচ্ছিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহ ও অন্যদিকে জাতপাতের ভেদাভেদে আকীর্ণ নানা গোত্রবর্ণের মানুষ এসময় ইসলামের সাম্যনীতির মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে নতুন এক সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় স্বতস্ফূর্ত অংশীদার হয় । আর পূর্ববর্তী সেন বংশের শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত ও অনেকাংশে আত্মগোপনকারী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও অবশেষে এই নতুন সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় (সিদ্দিকী, ১৯৮৭)।

অন্যদিকে, প্রাচীন কোল, মুণ্ডা, মাহাতো, বাগদী, বুনো আদি অস্ট্রাল শ্রেণীর রক্তধারার উত্তরাধিকারী মানুষদের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের মধ্যে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে এ রক্তধারার মানুষজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে। বর্তমানে এদের বেশীরভাগই মুসলিম কিংবা সনাতন ধর্মীয় জনসমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে । এরাই ছিল সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে বিচরণকারী সব থেকে প্রাচীন মানুষ ও আদিম জনগোষ্ঠী। বঙ্গদেশ তথা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনসমাজের নির্মাণশীলার প্রথমটি ছিল এরাই ।

গবেষণাধীন এই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জৈবিক উত্তরাধিকার যে প্রটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণীর মানুষজনের মধ্যে নিহিত তা দুইভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। প্রথমটি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক ধারা, দ্বিতীয়টি আধুনিক ধারা। আর এই আধুনিক ধারাটি বৃটিশ আমল থেকে দেখানো হয়েছে।

বৃটিশ শাসনামলে জ্ঞাত অন্যান্য অঞ্চলের মত বঙ্গ অঞ্চলেও নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে যে সকল পুরোধা গবেষক অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে- E.T Dalton, Haddon, Herbert Risley, Hatton, O' Malley, W. Hunter, Grierson, Huchinson, E.A Gait এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকেই তৎকালীন বঙ্গে আগমন ও বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীসমূহের স্থানান্তরকরণ, অবস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন

তথ্যসমূহকে ঘটনা পরম্পরায় সাজিয়ে একটি চিত্র নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক/জাতিতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। আর এভাবে জাতিতাত্ত্বিক নিপাতন পদ্ধতির মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্যসমূহের বইপত্র,নথিপত্র,দলিল দস্তাবেজ) বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশ বক্ষ্যমান গবেষণাধীন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উৎঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বৃটিশ শাসনামলের শেষদিকে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিনাঞ্চলের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে নতুন উপাদান প্রযুক্ত হতে থাকে । তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসকগণের নানা রচনাবলি ও সরকারি দলিলপত্রে দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই তিন দশক অবধি সময়কালে বিপুল সংখ্যক আদি অস্ট্রাল শ্রেণীর উপজাতি মানুষজন এই অঞ্চলে আগমন করেছে । এই সময় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা দার্জিলিং আসাম অঞ্চলে চা বাগান তৈরি, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নীলচাষ, রেলপথ স্থাপন, সড়ক নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ খনিজ সংগ্রহ প্রভৃতি প্রয়োজনে পূর্ব-মধ্যভারতের নানা অঞ্চল হতে বিভিন্ন আদিম উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোকদের শ্রমিক হিসেবে আমদানি করতো (সিদ্দিকী,১৯৯৮)। ড. আনোয়ারুল করিম তাঁর The Myths of Bangladesh: Minor Tribes of Kushtia and Tribalism গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-The Hill men of the west furnish, the sine as by which English Enterprise is carried on in Eastern Bengal. Many of them come from the central highland. Where the population is permanently just one degree absolute starvation(Karim,1988)। তাছাড়া এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিই আনুকূল্য প্রদান করেছে নানান আদিম জনগোষ্ঠীকে বসবাস করবার । আবার এদের বিস্তারের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এরা ভারতের বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন জংগল যেমন-ডুয়ার্স, ডাল্টনগঞ্জ, পালমৌ, বেতলা, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অধিক সংখ্যক বসবাস করে । পরবর্তীতে খাদ্য অন্বেষণের তাগিদে এরা পশ্চিম বাংলার লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ে । তারপর এক পর্যায়ে তারা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়ায় এদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

বৃটিশদের অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার শ্রেণী বন-জঙ্গল বিনাশ করে কৃষিজমি উদ্ধারের জন্য কোল, মুণ্ডা, মাহাতো, বাগদী, বুনো প্রভৃতি মানুষজনদের মৌসুমী শ্রমিক হিসেবে ভাড়া করে নিয়ে আসতো (রায়, ১৯৭৪)। এই উপজাতি মৌসুমী শ্রমিকরা মৌসুম শেষে ফিরে যেত নিজেদের আদি নিবাস রাঁচী, হাজারীবাগ,পালামৌ, দামান-ই-কোহ সহ ছোটনাগপুরের বন পাহাড়ী অঞ্চলে। কিন্তু অনেক বছর এইরূপ যাতায়াত প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এইসব মৌসুমী শ্রমিকদের অনেকেই এদিকে আস্তে আস্তে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করে। তারা এখানে বিপুলায়তন জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমি উদ্ধারের কাজে শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হয়। তাদের অনেকেই স্থানীয় জমিদারদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে নানা স্থানে নির্মাণ করে ঘরবাড়ি, জঙ্গল সাফ করে তৈরী করে নিজেদের চাষাবাদের জমি, শুরু করে পশুপালন ও কৃষিকাজ। চিরায়ত বনপাহাড়ী অস্থিতিশীল জীবনধারার চেয়ে এই নতুন অবস্থাকে তারা উত্তম বিবেচনা করে এখানেই থেকে যায় (O'Mallay,1916)। এরা এতদঅঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গিয়ে চারপাশের কৃষি সমাজের উৎপাদন কৌশল, জীবনযাপন রীতি ও সামাজিক নানা বিষয়কে গ্রহণ বা অনুসরণ করতে শুরু করে। এই সমতল ভাগে কৃষিকেন্দ্রিক জীবন তাদের পার্বত্য জঙ্গলাকীর্ণ

জীবনধারা থেকে আলাদা । তারা প্রধানত অস্থায়ী যাযাবর ধরণের জীবনে অভ্যস্ত ছিল । শিকার ও সংগ্রহই ছিল তাদের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি, জীবিকার প্রধান অবলম্বন। গৃহনির্মাণ, পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস, সমাজ সংগঠন প্রভৃতি সবকিছুর উপরই ছিল অরণ্যচারী অস্থায়ী জীবনের ছাপ। কিন্তু বাংলাদেশের এই সমতলভাগে বসবাস করতে গিয়ে তারা তাদের জীবনধারাকে নতুন করে গড়ে পিটে নিয়েছে অত্রাঞ্চলের সংস্কৃতির আদলে। নিজেদেরকে অভিযোজিত করে নিয়েছে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে।

বঙ্গ জনপদে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের সূচনা করেছিলো আদি-অস্ট্রাল শ্রেণীর মানুষজন। সেকারণে ধান,পান, নারিকেল, সুপারি, কচু, কলা,লাউ প্রভৃতি তাদের নিকট থেকে উদ্ভূত শব্দসমূহ অদ্যাবধি অত্র অঞ্চলের কৃষিকেন্দ্রিক মানুষজনের জীবন ঘনিষ্ঠ শব্দ হিসেবে বিরাজমান।আবার ধনু, বান, ঝোঁপ, ঝাড়, ঠ্যাং, জাং, পগার, দাও (দা), করাত, চিড়া, মুড়ি, ধান, কলা, হলুদ, মরিচ, বেগুন, কুমড়া, তেজপাতা ইত্যাদি শব্দসমূহ এ অঞ্চলের অধিবাসীদের অস্ট্রিক যোগসূত্রই প্রমান করে। তাছাড়া এ অঞ্চলের কৃষককূলের চাষাবাদের যে ধরণ, তা অস্ট্রিক ধারার মানুষের নিকট থেকেই প্রাপ্ত। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত অরণ্য/জলাশয়চারী মানুষজনই বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জৈবিক উত্তরাধিকারের ধারক। অর্থ্যাৎ প্রটো-অস্ট্রালয়েড রক্তধারার মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বক্ষ্যমান গবেষণা অঞ্চলের মানুষের নৃতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার।

উপসংহার (Conclusion)

আজকের বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ সমতলভাগ যেন নানাবর্ণে রঞ্জিত অনন্য এক সাংস্কৃতিক মোজাইক। সহস্র বছর ধরে নানা রক্তধারার মানুষের জৈবিক মিলন মিশ্রণের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে এ মিশ্র লোকসমাজ। এখানে যুগ যুগান্তর ধরে চলছে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে অবিরাম সাংস্কৃতিক লেনদেন। কোন একটি জনপদের বিকাশ স্থিতি এবং তার সুসংগঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে উঠার জন্য হাজার হাজার বছর সময় প্রয়োজন হয়। প্রাচীন বঙ্গ ভূমির অংশ হিসাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অজস্র সামাজিক,রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া এবং নানা গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীর আগমন বসতি স্থাপন পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলে এবং রক্তের উত্তরাধিকার বিস্মৃত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের গোত্রগত পরিচয়ের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষণীয়। হাজার হাজার বছর ধরে অত্রাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনধারা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উৎঘাটন জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের একটি নতুন মাত্রা হিসেবে পরিগনিত হতে পারে। স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীকরণের মাধ্যমে যেমন হারিয়ে যেতে পারে,তেমনি নিরন্তর সংস্কৃত্যায়নের(Acculturation) মাধ্যমে তাদের জীবনধারা বদলে যেতে পারে। রীতি অনুযায়ী পরিবেষ্টনকারী বৃহৎ গোষ্ঠীর সংস্কৃতির নানা উপাদান উপকরণ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলি অনুকরণ বা গ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে দিয়েই তারা নিজেদের সামাজিক অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। বাংলাদেশের নানান প্রান্তে কোল, ভীল, মুণ্ডা, সবর, হো, কৈবর্ত, মেচ, কোচ, মালপাহাড়ী, বুনো , বাগদী, ইত্যাদি নানান ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বাস করে। এদের প্রত্যেকের রয়েছে স্ব স্ব সংস্কৃতি। বাংলাদেশের বৃহত্তর সংস্কৃতির মধ্যে তারা অবিরাম নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে চলেছে। আবার অনেকাংশে অন্তর্লীন প্রক্রিয়ায় (Assimilation Process) হারিয়েও যাচ্ছে। নৃতাত্ত্বিকভাবে এটাই স্বতঃসিদ্ধ। সাধারণত হাজার হাজার বছর সময় প্রয়োজন হয় কোন একটি জনপদ পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠতে। কারণ তার বিকাশ, স্থিতি, সমাজ সংগঠন ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার পূর্ণরূপ অবশেষে বিলুপ্ত হয় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত আদিম জনগোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রেও নৃবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি । জানা অজানা নানা কারণ ও বিভিন্ন ভাঙ্গা গড়ার মধ্যদিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে এই জনপদ নির্মাণের কারিগর, এখানকার অধিকাংশ মানুষের রক্তের উত্তরাধিকার।

তথ্যসূত্র (References)

Bakar, A (1971). Human Settlement in the Bengal Basin in Relation to Geological Setting, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, 16 (1).

Grierson, E. A (1906). *Linguistic Survey of India*. Vol-4. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing.

Karim, A (1988). *The Myths of Bangladesh: Minor Tribes of Kushtia and Tribalism*. Kushtia: Folklore Research Institute.

Majumder, R.C (1971). *History of Ancient Bengal*. Calcutta: G. Bharadwaj & Co.

Maloney, C (1977). Bangladesh in its people in prehistory, *Institute of Bangladesh Studies Journal (IBS)*, Vol-11, Rajshahi.

O' Mallay, L. S. S (1916). *Bengal District Gazetteer Rajshahi*. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot.

Paul, P.L (1939). *The Early History of Bengal*, vol-1. Calcutta: Indian Research Institute Publication.

Scheffler, T (2003). Fertile Crescent Orient Middle East: The Changing Mental Maps of Southwest Asia. *Europian Review of History*, Vol.10(2).

আলী, এম, আফসার (২০১২)। *গাঙদ্বীপের সাতকাহন*। ঢাকা: উত্তরণ।

ওয়াইজ, জে. (সম্পাদিত)। (২০০২)। *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ* (তৃতীয় সংস্করণ)। ঢাকা: সুবর্ণ।

চট্টপাধ্যায়, সুনীতি. কু. (১৩৫১বাংলা)। *ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। কলকাতা: দেশ।

জলীল, আ. ফ. ম.আব্দুল (১৯৭৫)। *সুন্দরবনের ইতিহাস*। খুলনা: নূর মঞ্জিল।

পালিত, অরবিন্দ (১৯৯৮)। *ভারতে মঙ্গোলয়েড জীবনধারা*। কলকাতা: ভারবি।

বন্দোপাধ্যায়, আর (১৯৭৪)। *বাঙ্গালার ইতিহাস*(২য় খন্ড)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউজ।

মজুমদার, আর (২০১৪)। *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)*, ১০ম সংস্করণ। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স।

রায়, অজয় (১৯৯৭)। *আদি বাঙ্গালী ঃ নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রায়, এন, আর (১৯৭৪)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, নব সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সামাদ, এ. জি (১৯৭৮) *বাংলাদেশ ঃ মানুষ ও ঐতিহ্য*। রাজশাহী: ইউনাইটেড প্রেস।

সুর, অতুল (১৯৯৮). *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা এজেন্সিস।

সিদ্দিকী, এ, আর (১৯৮৭)। *বরেন্দ্রভূমির সাঁওতাল উপজাতি*। রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সিদ্দিকী, এ. আর (১৯৯৮)। বরেন্দ্রভূমির চিরায়ত বাসিন্দা ঃ নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধাণ, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*। *রাজশাহী বিভাগ : ইতিহাস-ঐতিহ্য* (সম্পাদনাঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া) বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

[Manuscript received on 12 December, 2023; accepted on 12 January, 2024]